# অপরাহ্নের গল্প

কৃষ্ণা রায়

পুনশ্চ

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| বিষাদ-গোধূলি | ৯ |
| ধ্রুবনক্ষত্র | ১৮ |
| প্রথম মায়া | ২৪ |
| মোমের আলো | ৩০ |
| পরভূমি | ৩৬ |
| রূপ-তাপসী | ৪৬ |
| পাহাড়-চূড়ায় | ৫৫ |
| চোরা স্রোতে | ৬২ |
| 'এক টুকরো দীনতা | ৬৭ |
| মায়া চাবি | ৭৮ |
| মধ্যাহ্নের রাখাল | ৮৭ |
| ছায়াপথে | ৯৩ |
| কালবেলা | ৯৮ |

# বিষাদ-গোধূলি

শোবার ঘরটার একেবারে ভগ্নদশা। সিলিং-এর কড়িকাঠগুলো ঝুঁকে পড়েছে, দমকা হাওয়ায় মাথা নাড়াতেও দ্বিধা করে না। আসবাবপত্র যা কিছু ছিল সবই একে একে সরে গেছে। পঁয়ত্রিশটা বছর তো কম নয়। পড়ে আছে শুধু মলিন ড্রেসিং টেবিলটা আর দুটো ছোটো সোফা। টেবিলের ওপর সেই হাতকাটা ভেনাস মূর্তিটায় অবশ্য একটুও জরাচিহ্ন লাগেনি। কালো পালিশের আবরণে কৃষ্ণনগরের মাটির মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে পুরনো অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বললাম, এ ঘর সাজাতে মন্দ খরচ হবে না। জানলার পাল্লা, দরজা, দেওয়াল, ছাদ সবই তো বদলাতে হবে। মেঝে কী রকম হবে? এই লাল সিমেন্ট তুলে মার্বেল, না মোজাইক। কী বসাবে বল?

মণিকাকিমা আকুল হয়ে বললেন, যাই খরচ লাগুক, ঘরটা সারানোর ব্যবস্থা কর মিতুল। টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবিস না। হ্যাঁ রে, বসার ঘরটাও সারিয়ে দিবি তো?

বসার ঘর! বহুদিন পর কথাটা শুনলাম। একসময় এই চিলেকোঠার ঘরটার বড্ড কদর ছিল। কাকা-পিসিদের বন্ধু-বান্ধব এলেই সটান এই ঘরে চলে আসত। সতরঞ্চি, মাদুর আর গোটা চারেক মোড়া, জলচৌকি দিয়ে সাজানো নিরালা ঘরে আড্ডা জমত প্রতি শনি-রবিবার। আর অন্য সময় ছিল আমার লুকোচুরি খেলার জায়গা। তখনও মণিকাকিমার বিয়ে হয়নি।

মণিকাকিমা আসলে আমার মেজকাকিমা। বিয়ের সময় অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। ভালো গান জানতেন, চমৎকার কবিতা লিখতেন, ঘর সাজাতেন, আর রান্না ছিল মণিকাকিমার প্যাশন। পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না। তবু মেজকাকার প্রবল তাড়নায় তাঁকে পড়াশুনো করতে হয়েছিল, গ্র্যাজুয়েট তাঁকে হতেই হয়েছিল। অসামান্য রূপ আর অপরিসীম শিল্পবোধ নিয়ে মণিকাকিমা শ্বশুরবাড়িতে আসার পর থেকেই অনেক কিছু ঘটতে লাগল। আমরা ছোটোরা অবাক হয়ে দেখতাম মণিকাকিমার সকালের স্নিগ্ধসাজ, সন্ধেবেলায় অনুপম প্রসাধনে ঘেরা অপূর্ব মুখশ্রী। আমাদের পুরনো বাড়ির জেল্লা-বর্জিত দরজা-জানলায় লেসের পর্দা টাঙানো হল, বসার ঘরের জলচৌকিতে বসল ফুলদানি। পাতাবাহার কিংবা রজনীগন্ধার দুটো সতেজ ডাঁটিতে ঘরের চেহারা একেবারে বদলে গেল। ছাদে এল টব, সেখানে গোলাপ, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকার চাষ শুরু হল। মণিকাকিমার সর্বক্ষণের সঙ্গী আমি, আর আমার জনাতিনেক 'তুতো' ভাইবোন।

মণিকাকিমা রবিবার সকালে আমাদের আঁকা শেখানো শুরু করলেন। নতুন ঢঙে চুল বাঁধা শিখলাম, শিখলাম কেক-পুডিং করা। তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। বারো বছরের কিশোরীর চোখের পাতায় মুগ্ধতা মাখিয়ে দিলেন মণিকাকিমা। তবু কখনও কখনও একটু বেশি রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পেতাম ঠাকুমা চাপা গলায় মাকে বলছেন, মোহিনী-মায়া বুঝলে বউমা। রং-ঢং-ছলা-কলা দেখিয়ে আমার ছেলেটাকে তো ভেড়া বানিয়েছে, আবার ঘরের কচি ছেলেপুলের ওপরও নজর পড়েছে। মেয়েকে সামলাও বউমা, সইবে না। মা মৃদু গলায় বলতেন, মিতুলটা কাকিমার বড্ড ন্যাওটা। মণিদীপাও ওকে বড্ড ভালোবাসে, অত ভাববেন না। ঠাকুমার গলা বিচ্ছিরি রকমের তেতো হয়ে উঠত, থাক বাছা, ভালো কথার তো কেউ নও তোমরা। ও মেয়ে তুক-তাক জানে, বলে কিনা, মা চিলেকোঠার ঘরটা তো পড়ে আছে। আমি ওটাকে সারিয়ে নিয়ে বেডরুম আর ড্রয়িংরুম করে নেব। এটা একটা কথা হল? চিলেকোঠার ওই ঘরটা তো আমার বাবা আমার জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই এত বড়ো সংসার, লোকজন, আসা-যাওয়া, রাতে অন্তত তাঁর মেয়েটা ভালো করে যাতে ঘুমোতে পারে। তা সে ঘুমও ঘুচে গেল। স্বামী না থাকলে শোবার ঘরের মূল্য কী? এখন ছেলে-মেয়েরা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নিরিবিলিতে একটু গল্প-গাছা করে, সেখানেও ডাইনিটার চোখ পড়েছে। প্রাণ থাকতেও ও-ঘর ওকে আমি দেব না।

ঘরের লাল টুকটুকে মেঝের ওপর মস্ত পদ্মফুলের আলপনা। ঠাকুমার বাবা নিজস্ব মিস্ত্রি দিয়ে এ ফুল ফুটিয়েছিলেন ঘরের মেঝেতে। পদ্মফুলটা মণিকাকিমারও খুব পছন্দ ছিল। রাঙাপিসির পাকা দেখার সময় ওই পদ্মফুলের ওপর মাটির প্রদীপ আর মাটির খুরিতে গোলাপের পাপড়ি জলে ভাসিয়ে মণিকাকিমা ঘর সাজিয়েছিলেন। পাত্রপক্ষের লোকেরা মুগ্ধ। ওদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে লাফিয়ে লাফিয়ে মণিকাকিমার ঘরে ঢুকে বলেছিলাম, জানো তো মেজোকাকিমা, ওরা তোমার ঘর সাজানোর ভীষণ প্রশংসা করছিল। কাকিমা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, দেখ মিতুল, আমায় আর কখ্খনো মেজোকাকিমা বলে ডাকবি না।

আমি ভয় পেয়েছিলাম, কেন? কী হয়েছে তাতে? কাকিমার গলায় দুঃখ ছিল, না রে মেজোকাকিমা, মেজোবউমা এই ডাকগুলো খারাপ। ছোটোবেলায় কে যেন বলেছিল, সংসারে 'মেজোরা' বিশেষ সুবিধার হয় না। তুই আমায় মণিকাকিমা বলে ডাকবি।

আমি আশ্বস্ত হয়ে বলেছিলাম, সে না হয় ডাকব। কিন্তু সংসারে 'মেজোরা' খারাপ হয় একথা ভাবতে যাবে কেন? তোমাকে আমরা ভাইবোনেরা কত ভালোবাসি। মা তোমার কত প্রশংসা করে, বাবা বলে মণিদীপা বেশ ভালো কবিতা লেখে, রাঙাপিসির মতো খুঁতখুঁতে লোকও তোমার রান্নার প্রশংসা করে, তাছাড়া...

থাক মিতুল, অনেক বকেছিস। তোর ঠাকুমা, তোর অন্য পিসি, কাকারা আমায় একটুও পছন্দ করে না, আমি জানি রে। মণিকাকিমার দু-চোখে জল, আমার গলার কাছে কী একটা আটকে যায়, কেন এমন হবে? মণিকাকিমা তো সবার জন্য কিছু না কিছু করার চেষ্টা করে।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে দেওয়ালের রং ঝরে পড়ে গেছে। বসার ঘরের লাগোয়া তেকোণা রান্নাঘরের টেবিলে মরচে-ধরা কালো কড়াইটা পড়েই আছে। টেবিলের নীচের তাকে দুটো সিমেন্টের টব... বাথরুমের ভাঙা টেলিফোন শাওয়ারটা হুকে লাগানো,...কতদিন পর এ ঘরগুলোয় এলাম আমি? মনে করতে পারলাম না চট করে। মণিকাকিমার এ সংসার অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ঠাকুমার কাছ থেকে অনেক সাধ্যসাধনা করে তেতলার ছাদের ওপর এই চিলেকোঠাটা দখল করেছিলেন মেজকাকা। দু-মাস ধরে মণিকাকিমা মিস্ত্রি খাটিয়ে ড্রয়িংরুম, বেডরুম, কিচেন, টয়লেট সবই তৈরি করেছিলেন। ছাদের ওপর ঘর, তাই ঘরের চারপাশে টব বসিয়ে পাতাবাহারের শ্যামল স্নিগ্ধতা নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু থাকতে ওঁরা পারলেন না। মাত্র আট মাস। তারপরই বাড়ি ছাড়লেন মণিকাকিমারা। আসলে মেজকাকা তখন নামী কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। পুরনো বাড়ির তেতলায় ওদের বন্ধু-বান্ধবের আসা যাওয়া, ছোটোখাটো পার্টি-উৎসব, ঠিক মানানসই হচ্ছিল না। ওঁরা বাড়ি ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে উঠে গেলেন। লেকের খুব কাছে, বাগান সমেত দোতলা বাড়ি। মণিকাকিমা যাবার আগে বলে গেলেন, মিতুল নতুন বাড়িতে সপ্তাহে একদিন অন্তত আসিস।

চিলেকোঠার ঘরে ঝুলল মস্ত তালা। ছাদের বাগানের টবে জল দিই, মাদুর পেতে বসি। আমাদের বাড়িতে তখন অনেক লোক। তিন কাকা, দুই পিসি, মা-বাবা, ঠাকুমা, ঠাকুমার বোন, ভাইপো। এরই মধ্যে বিভিন্ন কাজে শহরতলি থেকে আসা আত্মীয়স্বজনেরাও আশ্রয় নিত। আমার পড়ার কোনো স্থায়ী জায়গা ছিল না। ছোটো ছোটো ঘর, জিনিসপত্রে ঠাসা দালান, একমাত্র ছাদটাই ছিল ফাঁকা। তখন ক্লাস টেন-এ উঠেছি। পড়াশুনোয় মন্দ নই। একরাশ বইপত্র রাখার আর জায়গা পাই না। ছাদের সিঁড়ির ধাপে ধাপে বাংলা, ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির বই সাজিয়ে রাখি। বাড়িতে পড়ার টেবিল একটা। সেটা ছোটোকাকার দখলে। ছোটোকাকা তখন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসের ছাত্র। আমার দুর্দশা দেখে মা-র খুব কষ্ট হত। একদিন চুপি চুপি বললেন, তোর মণিকাকিমাকে একবার বলে দ্যাখ না, তোকে কত ভালোবাসত। সামনে পরীক্ষা। যদি ঘরটা খুলে দেয়।

এখনও মনে আছে সেই বাসন্তী-হলুদ বিকেলটার কথা। বাড়ির সামনের বাগানে গার্ডেন-চেয়ার পেতে চা খাচ্ছিলেন মণিকাকিমা আর তার মা। আমায় দেখে মণিকাকিমা সাদরে বসালেন। কেক, বিস্কুট, মিষ্টিভরা থালাও মুখের সামনে ধরলেন।

কথাটা গুছিয়ে বলে উঠতে পারছিলাম না। মণিকাকিমা বলেছিলেন, কী রে, খা ওগুলো।

বলেছিলাম, খিদে নেই।

কেন রে?

তুমি কেন ও বাড়ি ছাড়লে মণিকাকিমা? তোমায় খুব মিস করি আমি।

মণিকাকিমা আদর করে আমার ঘন চুল এলোমেলো করতে করতে বলেছিলেন, দূর পাগলি! ইচ্ছে হলেই চলে আসিস।

বলি বলি করেও কথাটা সেদিন বলতে পারিনি। বাড়ি ফিরতে মা বললেন, কী রে, কী বলল?

কিছু বলিনি মা। ভীষণ লজ্জা করছিল।

মা মুখ বেঁকিয়েছিলেন, তোর দ্বারা কিস্‌সু হবে না।

ক্লাস ইলেভেনে উঠলাম। আমি ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। টিচাররা আমার ওপর ভরসা রাখেন বুঝতে পারি। ঠাকুমাকে একদিন বললাম, মেজকাকাকে তুমি একবার বল না, যদি দুটো বছর আমার পড়ার জন্য বসার ঘরটা খুলে দেয়।

ঠাকুমা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন? সেই ডাইনিটার সঙ্গে তো তোমার মস্ত ভাব। সে বোঝে না, এতজনের সংসারে ঘর বন্ধ করে রাখাটা মহাপাপ?

আমাকে কিছু বলতে হয়নি। পরের দিন মেজকাকা বাড়িতে আসতেই ঠাকুমা কথাটা শুরু করলেন।

মেজকাকা করুণ গলায় বলেছিলেন, মা আমেরিকাতে আরও পড়াশুনো করার সুযোগ পেয়েছি। সামনের মাসেই চলে যাব। তোমার মাসিক খরচের টাকার ব্যবস্থাটা চালু রাখার জন্য তেতলার ঘর দুটো ভাড়া দেব। সাউথ ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি, স্বামী-স্ত্রী আর বাচ্চা। খুব ভদ্র ওরা। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে তোমার হাতে ভাড়ার টাকা তুলে দেবে।

আমার পড়ার জায়গার সুরাহা হল না। ছাদের এক কোণে মাদুর পেতে পড়ি, রোদ লাগলে জায়গা বদলে নিই। সাউথ-ইন্ডিয়ান পরিবারটি নিজেদের মতো থাকে, মেলামেশার চেষ্টা করে না। আমি অনেক সময় ছাদে পায়চারি করে পড়ি। চোখাচোখি হলে হাসি, ওরাও হাসি ফিরিয়ে দেয়। ওই পর্যন্ত। হায়ার সেকেন্ডারিতে আমি স্ট্যান্ড করেছিলাম, পনেরো ছিল আমার র‍্যাঙ্ক। খবর জেনে মেজকাকা দারুণ একটা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন। সাউথ-ইন্ডিয়ান ফ্যামিলিটি বছর দুয়েক থেকে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। মেজকাকা সে সময় দেশে ফিরেছিলেন। মণিকাকিমা আরও সুন্দরী হয়েছেন, সর্বাঙ্গে সচ্ছলতার প্রলেপ। দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় ঘরের দরজায়

মস্ত পিতলের তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন ওঁরা। এখন আর ভাড়ার টাকা নয়, যাবার আগে ঠাকুমার হাতে এক বছরের খরচ গুঁজে দিয়ে গেলেন মেজকাকা। সেদিন ছাদে উঠে একা একা খুব কেঁদেছিলাম। নিজের ওপর বড্ড মায়া হয়েছিল। বন্ধুরা বাড়ি এলে বলত, তোর পড়ার জায়গা কোন্‌টা রে? আমি হাসিমুখে ছাদের সিঁড়ির ধাপ দেখিয়ে দিতাম। বর্ষাকালটায় অবশ্য বড্ড কষ্ট হত। ঘরে ঘরে ভিজে কাপড় টাঙানো। ছাদের সিঁড়ি বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে, বইগুলো বুকে করে এ-ঘর ও-ঘর করি। আমাদের ঘরটা বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ছোটো। খাট আর আলমারিতে ঘরে পা রাখার জায়গা নেই। বিছানায় অসুস্থ বাবা, আমার বইপত্র নিয়ে পড়তে বসাটা সেখানে যথেষ্ট বিলাসিতা। রাতে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ি। বাবা চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন স্বাস্থ্যের কারণে। সংসারে সর্বক্ষণ দারিদ্র্যের চোখ রাঙানি। সেজকাকা আর ন-কাকা টুকটাক রোজগার করে। ছোটোকাকার ফাইন্যাল ইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং। অবস্থা দেখে এক পিসি পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে ভাব করে বিয়ে করে ফেলল। সে বাড়ির কালচার নেই, আয় প্রচুর। বাজারে মস্ত বড়ো মাংসের দোকান। সেজকাকার পরামর্শে ঠাকুমা বাড়ির একতলার একটা ঘর ভাড়া দিলেন। সেখানে টিউটোরিয়াল হোমের ক্লাস হয়, বাড়তি একটু টাকা সংসারে আসতে শুরু করল। কিন্তু পরিবেশটাই বদলে গেল। বিকেল থেকেই ছেলে-মেয়েদের জটলা, হাসাহাসি। আমি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিইনি, আমার স্বপ্ন ছিল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। সন্ধেবেলায় কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে অবসন্ন হয়ে পড়তাম। অল্পেতেই মা-কাকিমাদের কথা-কাটাকাটি, বাবার অন্তহীন ব্যাধি, ঠাকুমার রুক্ষ মেজাজ... ছাদে আলো জ্বালিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করলাম। ন-কাকা একদিন হঠাৎ ছাদে উঠে দেখতে পেয়ে বলল, তোর একার জন্য একটা ষাট ওয়াটের বাল্ব, তিন-চার ঘণ্টা জ্বলবে? মিতুল স্বার্থপর হোস না। সংসারে সবার কথা ভাবতে শেখ। চাঁদের আলোয় চিলেকোঠার ঘরের কাচের জানলাগুলো ঝকঝক করছিল। তালা ঝোলানো বন্ধ দরজার ওপারে কী সুন্দর একটা রূপকথার জগত রয়ে গেছে। সে তো আমি জানি। খাট, আলমারি, দামি সোফা-সেট, ড্রেসিং টেবিল, কাচের আলমারি ভর্তি বই, রবীন্দ্র রচনাবলী... দেয়ালে গোলাপি রং, শান্তিনিকেতনের বাটিকের ওয়াল হ্যাঙ্গিং... মণিকাকিমা কখনই নিষ্ঠুর হতে পারে না, মেজকাকা না হয় মেধাবী, কেরিয়ারিস্ট মানুষ, কাকিমা তো তেমন ছিল না। আমার পড়ার কথা মণিকাকিমা জানলেই...

দ্রুত চিঠির খসড়া শুরু করলাম, কিচ্ছু চাই না। মাত্র গোটা তিন-চার বছর, এম এসসি পাশ করে নিই, তারপর... দেখো, তোমার ঘরের কত যত্ন করি আমি...।

এম এসসি পাশ করা হয়নি আমার। এরোগ্রামে অক্ষর সাজিয়ে সামান্য